This book is part of the Carey Library and Research Centre at Serampore College.

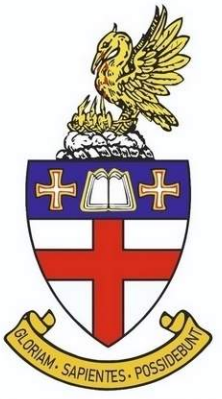

This is a reproduction of a library book that was digitized at the CLRC, Serampore.
The information in this book is freely available to the public and can be quoted with proper reference.

The use of this document may be subject to the Copyright Law of India or to site license or other rights management terms and conditions. The person using this document is liable for any infringement.

ড. উইলিয়াম কেরী

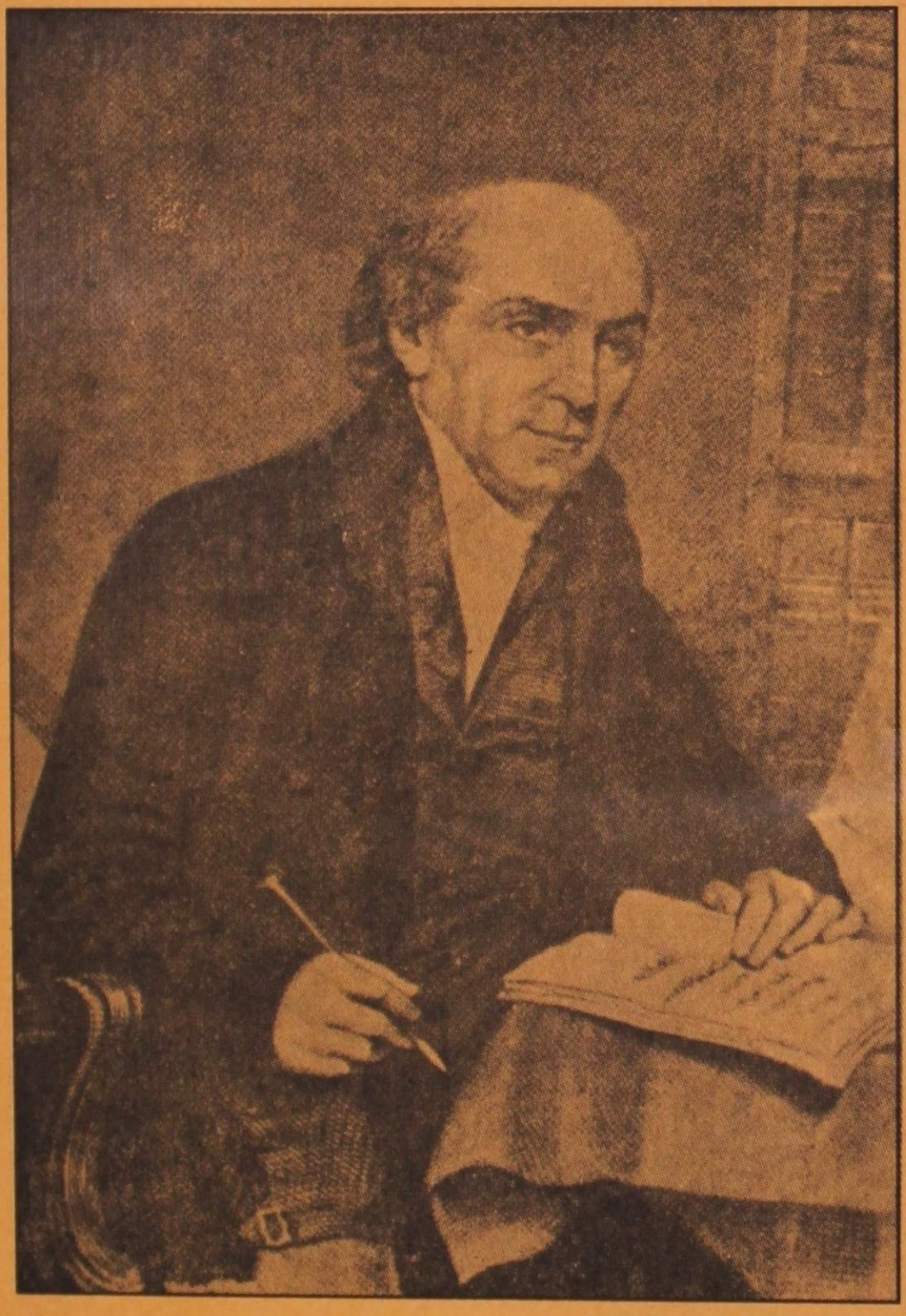

সুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায়

ড. উইলিয়াম কেরী

(১৭৬১-১৮৩৪)

বাংলা তথা ভারতের নবজাগরণের অন্যতম প্রধান রূপকার ডঃ উইলিয়াম কেরীর জীবনীগ্রন্থ বহু রচিত হয়েছে, তবু আমার বিশ্বাস তাঁর বিরাট অবদানের যথাযথ মূল্যায়নের প্রয়োজন আছে। খৃষ্টান ধর্মযাজক হওয়ায় তাঁর সকল কাজের অপক্ষপাত বিচার হয়েছে বলে মনে হয় না। অথচ তাঁর মত বহুমুখী প্রতিভা, অপরিমেয় কর্মক্ষমতা, উদার মানবদরদী ও সংবেদনশীল মন এবং অতুলনীয় চারিত্রিক দৃঢ়তার পরিচয় সে যুগে অতি অল্প মনীষীর মধ্যে দেখা গেছে। শিক্ষা, ভাষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, সমাজসংস্কার প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রে উনিশ শতকে যে পরিবর্তনের জোয়ার আসে তার প্রতিটি ক্ষেত্রেই আছে কেরীর পথিকৃতের অবদান।

ইউরোপীয় জনজীবনে রেনেসাঁসেব উচ্ছল উন্মাদনা যখন প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি করেছে, সেই সময় ১৭৬১ খৃষ্টাব্দের ১৭ই আগস্ট ইংলন্ডের নর্দাম্পটনের অন্তর্গত ছোট গ্রাম পলাসপিউরিতে উইলিয়াম কেরীর জন্ম হয়। তাঁর মাতার নাম এলিজাবেথ উইল্‌স্ ও পিতার নাম এডমণ্ড কেরী। এডমণ্ড তাঁত বুনে জীবিকা অর্জন করতেন। কিন্তু জীবনকে উন্নত করার আগ্রহে তাঁত বোনা ছেড়ে তিনি গ্রাম্যপাঠশালার শিক্ষকতা এবং গীর্জার কেরানীর কাজ গ্রহণ করেন। উইলিয়ামের শৈশবজীবন পিতার আদর্শে গড়ে ওঠে। পুত্র পায় পিতার শেখবার, জানবার, বড় হবার অদম্য আগ্রহ। আর সেই সঙ্গে ছিল তাঁর একাগ্রতা, পরিশ্রমপ্রিয়তা ও কর্মকুশলতা। উইলিয়ামের সম্বন্ধে তাঁর বাবা বলেছেন, "William's only special aptitude was steady attentiveness and industry, plus some arithmetic quickness." গাছপালা, কীটপতঙ্গ, পশুপাখী, প্রভৃতি সবকিছুকেই জানবার ইচ্ছায় উইলিয়ামের শৈশবের দিনগুলি ভরে ছিল। জর্জ স্মিথ লিখেছেন, "The village surroundings and country scenery coloured the whole of the boy's after life, and did so much to make him the first agricultural improver and naturalist of Bengal, which he became." ছোটবেলায় অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে পড়ার নেশা ছিল তাঁর এবং

আগ্রহ ছিল সবচেয়ে বেশী ভাষা শিক্ষার ওপর। নিজের চেষ্টায় অল্পদিনের মধ্যে তিনি গ্রীক, লাতিন, গণিত ও ধর্মশাস্ত্র পাঠ শেষ করেন। জীববিজ্ঞান ও ভ্রমণকাহিনী পড়তে তিনি বেশী ভালোবাসতেন। কলম্বাসের ভ্রমণকাহিনী পাঠে কেরীর খুব বেশী ঝোঁক থাকায় বিদ্যালয়ের বন্ধুরা তাঁকে ঠাট্টা করে কলম্বাস বলে ডাকতো। ভাষা শেখার পারদর্শিতা কেরীর ছিল বিস্ময়কর। লাতিন ভাষার শিক্ষক টমাস জোন্সকে তিনি কয়েকমাসের মধ্যে সমস্ত শব্দকোষ কণ্ঠস্থ করে শোনান। লেখাপড়া শেখার এতো আগ্রহ ও কুশলতা থাকা সত্ত্বেও তাঁকে বারো বছর বয়সে পাঠশালা ছাড়তে হয়। দরিদ্র এডমণ্ডের পক্ষে উইলিয়ামের পড়ার খরচ চালানো সম্ভব হয় না।

খুড়ো পিটারের সঙ্গে উইলিয়াম চাষবাসের কাজ করতে গেলেন। কিন্তু শরীরে সইলো না। তখন হ্যাক্‌ল্‌টনের মুচী ক্লার্ক নিকল্‌সের কাছে গেলেন জুতো সেলাই-এর কাজ শিখতে। প্রতি রবিবার সারা সপ্তাহের তৈরী আর মেরামত করা জুতো খরিদ্দারদের বাড়িতে পৌঁছে দিতে হতো তাঁকে। টমাস জোন্সের কাছে গ্রীক ও হিব্রু শিখতে থাকেন এই সময়। ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে নিকল্‌সের মৃত্যু হলে তিনি মিঃ টি ওল্ডের জুতোর দোকানে কাজ নেন। এখানে জন ওয়্যার নামক একজন সহকর্মীর সঙ্গে তাঁর বিশেষ হৃদ্যতা জন্মে। জনের সঙ্গ তরুণ কেরীর মনে অনেক পরিবর্তন আনে। মিথ্যাভাষণ ও অনেক নিন্দনীয় অভ্যাস তিনি পরিত্যাগ করেন। একান্তে বসে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করার অভ্যাসও তাঁর এই সময় জন্মায়। ধর্মের বই ও ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনায় তিনি অনেক বেশী আনন্দ পান। কর্মচর্চ্চার সময় বিখ্যাত প্রচারক টমাস স্কটের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। এই পরিচয় তাঁর ভবিষ্যত জীবনের ওপর অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করে। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে তিনি ডরোথি প্লাকেটকে বিয়ে করেন। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে নর্দাম্পটনের ব্যাপটিষ্টমণ্ডলীর পালকসংঘে যোগ দেন। কিন্তু তখনও কেরী নিজেকে অখ্যাত মুচী ছাড়া কিছুই ভাবতে পারতেন না। ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে তিনি মুলটনে একটি পাঠশালায়ে শিক্ষকতার চাকরি গ্রহণ করেন। কিন্তু শিক্ষকতা করে আয় হোতো সামান্য, তাই জুতো সেলাই এর কাজও তাঁকে চালিয়ে যেতে হয়। লেখাপড়া শেখা ও ধর্মচর্চাও এই সঙ্গে চলতে থাকে। টমাস কুকের ভ্রমণ কাহিনী পড়ে পৃথিবীর অ-খৃষ্টান দেশ সমূহের দুর্দশাগ্রস্থ মানুষের দুঃখ দূর করার প্রবল ইচ্ছা তাঁর মনে জাগে। কিন্তু অর্থ ও সুযোগের অভাব ইচ্ছাকে কার্যকরী করতে বাধা দেয়। ইতিমধ্যে তিনি ডাচ, ইটালিয়ান ও ফ্রেঞ্চ ভাষা শিখে ফেলেন। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে জুতো সেলাই ও শিক্ষকতার কাজ ছেড়ে দিয়ে তিনি লীষ্টারে ধর্মযাজকবৃত্তি গ্রহণ করেন। এই বৃত্তি পরিবর্ত্তনের সময় তাঁকে অনেক বিরোধিতা ও উপহাস সহ্য করতে হয়। নতুন পরিবেশে এসে ধর্ম প্রচারের কাজে আরও মনোযোগ দেন এবং

বিদেশে প্রচার কার্য চালাবার ইচ্ছাও প্রবল হয়। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে কেরী বিদেশে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশে একটি সংঘ গড়ে তোলার জন্য আবেদন প্রচার করেন। কিন্তু কোন সাড়া পাওয়া যায় না। পরের বছর 'An Enquiry' নামক একটি পুস্তিকায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে খৃষ্টধর্ম প্রচারের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে প্রচার সংঘ গড়ে তোলার আবার আবেদন জানান। এবার তাঁর প্রচেষ্টা সফল হয়। এই পুস্তিকাটি ব্যাপটিষ্টমণ্ডলীর সভ্যদের কাছে বিশেষ সমাদর ও গুরুত্ব লাভ করে। পরবর্তীকালে এই পুস্তিকাটি আধুনিক প্রচারকদের সনদ নামে অভিহিত হয়েছিল। শুধু তাই নয় কেরী পুস্তিকাটির মধ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের এমন নিখুঁত পরিচয় দিয়েছিলেন যা সকলকে বিশেষভাবে বিস্মিত করেছিল। স্মিথ বলেছেন, "The enquiry has literary interest of its own as a contribution to the statistics and geography of the world written in a cultured and almost finished style, such as a few, if any, University men of that day could have produced." ১৭৯২ খৃষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর কেটারিং-এর ঐতিহাসিক সভায় Enquiry সম্বন্ধে আলোচনা হয় এবং বিদেশে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে ব্যাপটিষ্ট মিশনারী সোসাইটি সংগঠিত হয়। কেরীর ইচ্ছা ছিল তাহিতি বা পশ্চিম আফ্রিকায় প্রচারক দল নিয়ে যান। কিন্তু এই সময় বাংলা দেশ হতে প্রত্যাগত জন টমাসের সঙ্গে দেখা হওয়ায় তিনি মত পাল্টান। রেভারেণ্ড জন টমাস (১৭৫৬-১৮০১) ছিলেন একজন চিকিৎসক ও ধর্মপ্রচারক। ইতিপূর্বে তিনি দুবার ভারত ভ্রমণ করেছিলেন। বাংলাদেশ সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল যথেষ্ট। টমাস বাংলাদেশে ফিরে যাবার জন্য উপযুক্ত সঙ্গী ও আর্থিক সাহায্য খুঁজছিলেন। কেরীর অনুরোধে সোসাইটি টমাসকে সাহায্য করতে রাজী হয় এবং তাঁর সঙ্গী হিসাবে কেরীকে মনোনীত করে। তাঁরা ভারত যাত্রার আয়োজন করতে থাকেন। প্রয়োজনীয় টাকার যোগাড় করাই ছিল সবচেয়ে বড় সমস্যা। তাছাড়া স্ত্রীকে রাজী করানোও বিশেষ চিন্তার ব্যাপার ছিল। কিন্তু সবচেয়ে বড় বাধা ছিল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিরোধীতা। অবাধ লুণ্ঠন, উৎশৃঙ্খল জীবন-যাপন, বাণিজ্যের নামে শোষণ ছিল কোম্পানীর বেশীর ভাগ কর্মচারীর প্রধান লক্ষ্য। মিশনারীদের উপস্থিতিতে এই কাজগুলির বিঘ্নিত হবার সমূহ সম্ভাবনা। তাই কোম্পানী তার রাজত্বে মিশনারীর প্রবেশ নিষেধ করে দেয়। কেরী ও টমাস কোম্পানীর কাছ থেকে অনুমতিপত্র জোগাড় করতে পারেন না। তাতে তাঁরা দমলেন না, বিনা অনুমতিতেই বাংলায় যাবার আয়োজন করতে থাকেন। কিন্তু বিনা ছাড়পত্রের যাত্রী নিয়ে যেতে কোন জাহাজই রাজি হতে চাইলো না। অবশেষে বহু চেষ্টার পর একটি দিনেমার জাহাজে তাঁদের স্থান হোল। কিন্তু জাহাজের

ভাড়া বেশী হওয়ায় তাঁরা আবার মুস্কিলে পড়েন এবং বন্ধুদের কাছে ভিক্ষে করে কোনরকমে অর্থ সংগ্রহ করেন। এই সংকটে বন্ধু রাইল্যাণ্ডের সাহায্য বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য, কারণ সাহায্য ছাড়া কেরীর পক্ষে সম্ভব ছিল না বাংলাদেশে আসা। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ১৩ই জুন বহু আশা ও উদ্বেগ নিয়ে বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন টমাস ও সপরিবারে কেরী। প্রবাসীরা অনেকদিন পরে দেশে ফেরার সময় যেরূপ আনন্দ পায়, তাঁরা সেই আনন্দেই স্বদেশ ত্যাগ করেন। এস. পি কেরী লিখেছেন, "They could exultantly say : men never saw their native land with more joy than we left it."

দীর্ঘ পাঁচ মাস তাঁরা তরঙ্গ-সঙ্কুল সমুদ্রের ওপর কাটান। কেরী এই সময় টমাসের কাছ থেকে বাংলা শেখেন এবং সঙ্গে সঙ্গে জেনেসিসের বাংলা অনুবাদের কাজ শুরু করেন। ১১ই নভেম্বর কেরী ও টমাসকে নিয়ে দিনেমার জাহাজটি কলিকাতার কাছে নোঙর করে। ছাড়পত্র না থাকলেও তাঁদের অবতরণে কোন অসুবিধা হয় নি। জাহাজঘাটেই কেরীর সঙ্গে টমাসের বাংলাভাষার শিক্ষক রামরাম বসুর পরিচয় হয়। তিনি শ্রীবসুকে মাসিক কুড়ি টাকা বেতনে মুন্সি নিযুক্ত করেন। বাংলা গদ্য সাহিত্যের অন্যতম সূচনাকারী রামরাম বসুর ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা ও শিক্ষার জন্যই কেরীর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল এদেশের নিদারুন প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকা এবং পরবর্তী জীবনে অভাবনীয়রূপে সফল হওয়া। কলিকাতায় নামার অল্পদিনের মধ্যেই তিনি মন্তব্য করেন, "I see one of the finest countries in the world, full of industrious inhabitants." কিছুদিন কলিকাতায় থাকার পর কেরী সপরিবারে পর্তুগীজ উপনিবেশ ব্যাণ্ডেলে আসেন। এখানে রোমান ক্যাথলিকদের মধ্যে বেশিদিন থাকতে পারেন না, চলে যান সুপ্রসিদ্ধ শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র নবদ্বীপে। এখানে কয়েকজন পণ্ডিতের সহৃদয় ব্যবহারে বিশেষ মুগ্ধ হন এবং স্থায়িভাবে থাকা ও ছেলেদের শিক্ষার জন্য জায়গাটি তাঁর খুব পছন্দ হয়। কিন্তু আর্থিক অনটন ও স্থায়িত্বের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসংস্থান না হওয়ায় সম্পূর্ণ নিঃস্ব অবস্থা কলিকাতায় ফিরে আসেন এবং মানিকতলায় একটি বাড়ীতে আশ্রয় লাভ করেন। শিবপুরে কোম্পানীর বোটানিক্যাল গার্ডেনের অধ্যক্ষ পদ লাভ করার জন্য তিনি এসময় চেষ্টা করেন, কিন্তু আবেদন করতে গিয়ে দেখেন আগেই ডাঃ রক্সবার্গকে নিযুক্ত করা হয়ে গিয়েছে। তখন কলিকাতা হতে শ্বাপদসঙ্কুল সুন্দরবনের দেহাট্টায় যান এবং সেখানে একজন ইংরাজ রাজকর্মচারীর কাছে আশ্রয় লাভ করেন। এভাবে বাংলায় পদার্পণের পর প্রায় সাত আট মাস হালভাঙা নৌকার মত সমস্ত পরিবার নিয়ে কেরীকে এক জায়গা হতে অন্য জায়গায় শুধু ঘোরাঘুরি

করতে হয়েছে। শারীরিক ও মানসিক অত্যধিক যন্ত্রণায় কেরী পত্নী প্রায় অর্ধ উন্মাদের মত হয়ে যান। এই নিদারুণ বিপর্যয়ের মধ্যেও কেরী তাঁর আসল উদ্দেশ্য একবারও বিস্মৃত হননি এবং বাংলা ভাষা শেখা একদিনও বন্ধ করেন নি। অবশেষে এই ঘোরাঘুরি শেষ হল। দেহাট্টায় তিনি যখন জমি নিয়ে চাষবাসের উদ্যোগ কচ্ছেন সে সময় টমাস তাঁর জন্য জর্জ উডনীর নীলের কারখানায় ম্যানেজারের চাকুরী জোগাড় করে দেন। ধর্মপ্রাণ কেরীর পক্ষে এই কাজ করা খুব কঠিন ছিল, কিন্তু আর্থিক অনিশ্চয়তা দূর হবে এইকথা চিন্তা করে তিনি চাকুরী গ্রহণ করেন। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে কেরী উডনীর চাকুরী নিয়ে মালদহের মদনাবতীতে আসেন এবং ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এখানে থাকেন। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই তিনি বাংলা ভাষা মোটামুটি কাজ চালাবার মত শিখে ফেলেন এবং নিজের সুবিধার জন্য একটি শব্দকোষ ও ব্যাকরণ রচনা করেন। মদনাবতীতে আসার পরই তিনি দেশীয় ছেলেদের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কেরীর লেখা হতে জানা যায়, ''We have formed a plan for setting up two colleges, for the education of twelve youths in each. I had some months ago set up a school but the poverty of the natives caused them frequently to take their children to work. To prevent this we intend to clothe and feed them, and educate them seven years in Sanskrit, Persian etc...'' এই সময় তাঁকে প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হতো। সারা সপ্তাহে নীলের কারখানা ও বিদ্যালয়ে কাজ করার পর প্রতি রবিবার পায়ে হেঁটে গ্রামে গ্রামে যেতেন বাইবেলের বাণী প্রচার করতে। বাংলায় বাইবেল মুদ্রিত করার ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপায়ণের প্রচেষ্টা তিনি এই সময় হতে শুরু করেন। মুন্সি রামরাম বসুর সহায়তায় তিনি সংস্কৃত ও হিন্দুস্থানী (উর্দু) ভাষাও শিখতে থাকেন। ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে জন ফাউন্টেন নামে একজন তরুণ মিশনারী তাঁর সঙ্গে যোগ দেন। কেরীর সঙ্গে তাঁর অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য ছিল। ফাউন্টেনের মত তরুণ আগ্রহী কর্মীকে পেয়ে কেরীর অনেক সুবিধা হয়েছিল। ফাউন্টেন খুব তাড়াতাড়ি কাজ চলনসই বাংলাভাষা শিখে নেন এবং বিদ্যালয় পরিচালনা ও ধর্মপ্রচারে কেরীকে সাহায্য করতে থাকেন। বাইবেলের বাংলা অনুবাদ ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ হয়েছিল। কিন্তু মুদ্রণের ব্যবস্থা তখনও করা সম্ভব হয়নি। এ ব্যাপারে কেরীর চেষ্টার অন্ত ছিল না। কিন্তু ছাপার খরচের হিসাব করে তিনি হতাশ হয়ে পড়েন। কলিকাতার মুদ্রাকরদের কাছ থেকে তিনি জানতে পারেন দশ হাজার কপি ছয় শত পৃষ্ঠার বই ছাপাতে খরচ হবে ৪৩,৭৫০ টাকা। বাংলা ভাষায় মুদ্রণ তখন শুরু হয়ে গেছে। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে চুঁচুড়ার এনড্রুস ছাপাখানা হতে হ্যালহেড সাহেবের

বাংলা ব্যাকরণ মুদ্রিত হয়। চার্লস উইল্‌কিন্স বইটির জন্য বাংলা হরফ নির্মাণ করান। এরপর কলিকাতার মুদ্রণশালা হতেও কয়েকটি বাংলা বই প্রকাশিত হয়। অর্থের অভাব না হলে কেরীর বাইবেলও ১৮০০ সালের আগেই ছাপা হয়ে যেতো। এদিকে কেরীর নীলকুঠির অবস্থাও শোচনীয় হয়ে ওঠে। দয়ালু উডনী ব্যক্তিগত ক্ষতি স্বীকার করেও কেরীকে আরও দু বছর কুঠি চালাবার ভার দেন। শুধু তাই নয়, কলিকাতার নীলাম হতে একটি কাঠের মুদ্রাযন্ত্র কিনে তিনি কেরীকে উপহার দেন। এই দান কেরীর জীবনে মহামূল্যবান। হতাশায় নিমজ্জিত কেরীর মনে নতুন আশার সঞ্চার হয়। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে নৌকাযোগে মুদ্রাযন্ত্রটি মদনাবতীতে আনা হলে কেরী আনন্দে এতো হৈ-চৈ করেন যে গ্রামের লোকেরা যন্ত্রটির নাম দেয় 'সাহেবদের ঠাকুর'। মুদ্রাযন্ত্রের পর দরকার হয় হরফের। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে কেরী কলিকাতায় কোম্পানির কারখানায় হরফের অর্ডার দেন। উডনী এবছর নীলের কারখানা তুলে দেন। অন্য কোন উপায় না দেখে কেরী মদনাবতীর কাছে খিদিরপুরে আর একটি নীলের কারখানা কিনে সেখানে চলে যান।

এই বছর কেরীর জীবনে আবার পরিবর্তন আসার সম্ভাবনা দেখা দেয়। ইংলন্ডের সোসাইটি একদল মিশনারী ভারতে প্রেরণ করেন। তাঁরা দিনেমার নগরী শ্রীরামপুর আশ্রয় পান। এই দলের ওয়ার্ড এলেন কেরীর সঙ্গে দেখা করতে। তাঁর সঙ্গে ভবিষ্যত কর্মপন্থা সম্বন্ধে আলোচনা করে কেরী বুঝলেন সকলকে সেখানে আনা সম্ভব হবে না। তখন ওয়ার্ডের অনুরোধে তিনি রাজি হলেন শ্রীরামপুরে যেতে। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের ২৫ এ ডিসেম্বর খিদিরপুরের সম্পত্তি ত্যাগ করে মুদ্রাযন্ত্র ও ফাউন্টেন সহযোগে কেরী শ্রীরামপুরের উদ্দেশে যাত্রা করেন।

উনিশ শতকের ঊষায় কেরীর অধিনায়কত্বে গঠিত হল শ্রীরামপুর মিশন। শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠা এবং এই মিশনের মধ্য দিয়ে প্রাচ্য জগতে খৃষ্টধর্ম শিক্ষার ব্যাপক প্রসার লাভ করা কেরীর জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। ঐতিহাসিকেরা তাই তাঁকে Father of modern missionary movement বলে অভিহিত করেন। ডাঃ হাওয়েলস্ বলেছেন, ''To Carey belongs the honour of bringing home to the western church as a whole the idea that Christianity involved a spirit of universal brotherhood and right of every man without distinction of race, colour or creed to know the highest, and to realise his divine sonship and the noblest possibilities of his soul in union with the Eternal son of God.''

নবগঠিত মিশনের সাংগঠনিক পরিচালনার দায়িত্ব ছাড়াও আর্থিক বিষয়,

চিকিৎসা ও বাইবেল অনুবাদের ভার কেরী নিজে গ্রহণ করেন। প্রথম বছরের মধ্যেই মিশনের জন্য সুবৃহৎ ভবন ক্রয় করেন। বিভিন্ন দিক হতে মিশনের ওপর যে সমস্ত আঘাত আসে তার ধাক্কা প্রধানতঃ তাঁকেই সামলাতে হয়। এই আঘাত আসে সবচেয়ে বেশি করে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও তার কর্মচারীদের তরফ হতে। তিনি এই আঘাত প্রতিরোধ করতে পেরেছিলেন কয়েকজন বিশিষ্ট শুভানুধ্যায়ীর সক্রিয় প্রচেষ্টায় এবং তা না হলে তাঁর মিশন গড়ে তোলার স্বপ্ন হয়তো সফল হতো না। এদের মধ্যে ডেনিস গভর্ণর কর্নেল বী, ডেভিড ব্রাউন, ক্লডিয়াস বুকানন, ডাঃ রক্সবার্গ, জর্জ উডনী প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গভর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলীর উদার সহানুভূতি ও সহৃদয় পৃষ্ঠপোষকতাও কেরীর বিঘ্নসঙ্কুল পথের মূল্যবান পাথেয় ছিল। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল ওয়ার্ড কেরীর পুত্র ফেলিক্স ও উইলিয়ামের সাহায্যে বাইবেলের বাংলা অনুবাদের মুদ্রণ আরম্ভ করেন। কাঠের পুরানো যন্ত্র এবং সীমিত সংখ্যার হরফ থাকায় কাজ খুব ধীরে ধীরে এগোয়। এজন্য কেরী বাইবেলের একটি অংশ মথিয়ে রচিত মঙ্গল সমাচার আগষ্ট মাসের মধ্যে প্রকাশ করেন। মিশন প্রেস হতে প্রকাশিত এইটিই প্রথম গ্রন্থ এবং বাংলা গদ্য সাহিত্যেরও এইটি প্রথম। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ সিবিলিয়ানদের এদেশীয় ভাষা, সাহিত্য, প্রভৃতি শিক্ষা দেবার জন লর্ড ওয়েলেস্‌লী কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। এই কলেজে বাংলা ভাষার অধ্যাপকের পদ গ্রহণের জন্য কেরীর কাছে আহ্বান আসে। এই আহ্বান কেরীর জীবনে পরম সৌভাগ্য বহন করে নিয়ে আসে, তাঁর জীবনে সংকটময় কালরাত্রির অবসানের দেখা দেয় সূচনা। ভাষা শিক্ষার এই বিশেষ স্বীকৃতিতে তিনি উদ্যম ও কর্ম-প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা ভাষার অধ্যাপকরূপে কেরীর এই নিয়োগ শুধু বাংলা গদ্য সাহিত্য সূচনার সুযোগ করে দিয়েছিল তা নয় বহু সম্ভাবনাময় সাহিত্যের পটভূমির দৃঢ় ভিত্তিও রচনার সুবিধা হয়েছিল। লর্ড ওয়েলেসলীর স্থলে কোম্পানির গভর্ণররূপে জর্জ বার্লোর নিয়োগে মিশনের সঙ্গে কোম্পানির সম্পর্ক অনেকটা অবনতি হয়। তিনি কেরীকে সাবধান করে দিয়ে জানান, ''Government did not interfere with the prejudices of the people''. পরিস্থিতি এমনই সঙ্কটজনক হয় যে প্রচার ও মুদ্রণের কাজ চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়। প্রতিবন্ধকতার সময় অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও কেরী হতাশায় ভেঙে পড়েন নি। দিনেমার গভর্ণর ক্রেফটিং-এর সাহায্যে এবারেও তিনি মিশনকে উদ্ধার করেন।

১৮০১ খৃষ্টাব্দে ৪ মে কেরী ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে যোগদান করেন

এবং সপ্তাহে ৪ দিন কলিকাতায় থাকার বন্দোবস্ত করেন। ১৩ জন ছাত্রকে নিয়ে তিনি বাংলা ক্লাস শুরু করেন এবং প্রথম টার্মের আগেই সংস্কৃত ভাষার শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হন। এখানে যোগ দেবার পর হতেই কেরী বাংলা ভাষায় গদ্য পুস্তকের অভাব দূর করার জন্য উঠে পড়ে লাগেন এবং অল্প কয়েক বছরের মধ্যে কলেজের পণ্ডিতদের দ্বারা কয়েকটি সকলের উপযোগী বাংলা গ্রন্থ রচনা করান এবং সেগুলি প্রেস হতে মুদ্রিত করান। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে তিনি মারাঠি ভাষা শিক্ষাদানেরও দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দ হতে বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক এবং মারাঠি ভাষার শিক্ষকরূপে কাজ করেন এবং তাঁর মাহিনা হয় মাসিক হাজার টাকা। কেরীর সঙ্গে বাংলা ও বাঙালির নিবিড় যোগ এই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্যই। সংস্কৃতের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ও প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের প্রকাশ্যে পরিচয় দেন ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত কলেজের বার্ষিক সম্মেলনে। বহু জ্ঞানী, গুণী ও বিশিষ্ট ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের এই সমাবেশে তিনি উদ্বোধনী ভাষণ দেন সংস্কৃত ভাষায়। সকলেই চমৎকৃত ও বিস্মিত হন। ইউরোপীয়দের মধ্যে তিনি প্রথম সংস্কৃত ভাষায় বক্তৃতা করেন। লর্ড ওয়েলস্‌লী তাঁর বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে বলেন, ''I am much pleased with Mr. Carey's truly original and excellent speech.'' কেরীর পারিবারিক জীবনেও এসময় আসে পরিবর্তন। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে সুদীর্ঘকাল মানসিক ও শারীরিক যন্ত্রণাভোগ করার পর কেরীর স্ত্রী শ্রীমতী ডরোথি কেরী মারা যান। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে চার্লোটি রুমার নামে একজন জার্মান ভদ্রমহিলাকে তিনি বিবাহ করেন। এই সময়টা তাঁর জীবনে ছিল বিস্ময়করভাবে কর্মময়। ভারতীয় বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা, বিভিন্ন ভাষার অনুবাদ, বিভিন্ন ভাষায় ব্যাকরণ, অভিধান ও শব্দকোষ রচনা, বাংলা গদ্যপুস্তক সংকলন, উদ্ভিদ উদ্যান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা, হিন্দু সমাজে নৃশংস প্রথাগুলি দূরীকরণের চেষ্টা প্রভৃতি ছিল তাঁর নিয়মিত কর্তব্যকর্মের মধ্যে। মিশন পরিচালনার সমস্ত দায়িত্ব পালন, মিশনকে ও মিশনারীদের সমস্ত বিপদ-আপদ হতে রক্ষা করা, নিয়মিতভাবে ধর্মপ্রচার করা এবং ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে তিনটি বিষয়ে অধ্যাপনার কাজ ছিল তাঁর নিয়মিত কাজের সর্বাগ্রে। তাঁর দৈনন্দিন কর্মসূচির পরিচয় পাওয়া যেতে পারে নিম্নলিখিত এই দিনলিপি হতে ঃ

''Thursday, June 12, 1806 : Calcutta :

5.45-7.0 Dressed, Read a chapter of the Bible, Devotions

7.0-10.0. Family worship in Bengali and with the servants. Read Persian with munishi, revised scripture proof in Hindusthani. Breakfast, translated a

portion of the Ramayan from Sanskrit into English with the help of Sanskrit Pundit.

10.0-1.30 Government college classes.

1.30-2.0 Dinner

2.0-6.0 Revised proof of a Jeremiah chapter in Bengali, translated most of matt. VII into Sanskrit with Mrityunjay's help.

6.0-7.0 Tea, Read Telugu with a pandit. A son of the Rev. Timothy Thomas of London called.

7.0-9.0 Prepared and preached an English sermon, about 40 present, including Judge Harrington...

9.0-11.0 Translated Exekiel XI into Bengali, letter to Ryland. Read a Greek Testament chapter, commended self to God.''

কেরীর জীবনে একটি দুঃখময় অধ্যায়ের সূচনা হয় ১৮০৬ খৃষ্টাব্দের পর হতে। এই অধ্যায় ব্যাপটিষ্ট মিশনের শ্রীরামপুর গোষ্ঠি ও ইংলন্ডের গোষ্ঠির মধ্যে বিরোধকে কেন্দ্র করে হওয়ায় কেরীকে সারা জীবন মর্মান্তিক মনোকষ্টে কাটাতে হয়। যদিও এই বিরোধ তাঁর বা মিশনের (কেরীর জীবদ্দশায়) অগ্রগতিতে কোনরকম বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর প্রেসে বিরাট অগ্নিকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়। এর ফলে প্রেসটি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কেরীর ব্যক্তিগত ক্ষতি হয় অপূরণীয়। ধ্বংসস্তুপের দিকে তাকিয়ে সজল চোখে তিনি বলেন, ''In one short evening labours of years are consumed.'' এই বিপর্যয়ে ভেঙে না পড়ে কেরী ও তাঁর সহযোগীরা নতুন উদ্যমে ধ্বংসস্তুপের মধ্য হতে আবার প্রেস গড়ে তোলেন।

অনেকে মনে করেন বহুভাষাবিদ পণ্ডিতের পরিচয়ই কেরীর শ্রেষ্ঠ পরিচয়। কর্মক্ষেত্রকে সঙ্কুচিত করে তিনি যদি শুধু ভাষাচর্চার ক্ষেত্রে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতেন তবে তাঁকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষাবিদরূপেই জানতাম। স্বতঃস্ফূর্তভাবেই তিনি শৈশব হতে বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা শুরু করেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বিভিন্ন ভাষাচর্চার মধ্যে কাটিয়ে যান। জাহাজে ছমাস এবং পরে মুন্সী রামরাম বসুর সাহায্যে তিনি বাংলাভাষায় বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করেন। পরে সংস্কৃতেও বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতদের কাছ থেকে তিনি ভারতের প্রধান দেশীয় ভাষাগুলি শিক্ষা করেন এবং অনেক উপজাতীয় কথ্য ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন, তবে ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে বাংলা ও সংস্কৃতেই তাঁর সবচেয়ে

বেশি দখল জন্মেছিল। এই দুই ভাষায় বিদেশিদের মধ্যে তাঁর মত পণ্ডিত সে সময় খুব অল্প কয়েকজন ছিলেন। তাঁর বিভিন্ন ভাষার জ্ঞানকে তিনি প্রধানতঃ অনুবাদ, ব্যাকরণ ও অভিধান রচনা ও গদ্য সাহিত্য সৃষ্টির কাছে লাগান। অনুবাদক হিসাবে তাঁকে সে যুগে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বলে অভিহিত করা যায়। অনুবাদকে তিনি ধর্মপ্রচারের অন্যতম প্রধান উপায় বলে মনে করতেন। তাঁর নিজের দ্বারা ও তাঁর পরিচালনায় ৪০টি এশীয় ভাষায় আংশিক বাইবেল প্রকাশিত হয়। মিশনের দ্বারা অনুদিত হয় আসামী, আওধি, বালুচী, বাংলা, ভাটনারী, ভুগেলী, বিকানিরী, ব্রজভাষা, বর্মী, চীনা, ডোগরী, গাড়োয়ালী, গুজরাটি, হারটি, হিন্দি, জয়পুরী, কনৌজি, কাশ্মীরি, খাসি, কোশল, কুমায়ূনী, কঙ্কন, কর্ণাটক, মাগধী, মালয়, মাল্‌ডেভিয়ান, মনিপুরী, মারাঠি, মারবারী, মেওয়ারী, মুলতানি, নেপালি, ওড়িয়া, পাল্‌পা, ফার্সী, পুস্তু, পাঞ্জাবি, সংস্কৃত, সিন্ধি, তেলেঙ্গা ও উজ্জয়িনী ভাষায়। এছাড়া শ্রীরামপুর প্রেস অপরের দ্বারা অনুদিত ফার্সি, আর্মেনীয়, সিংহলী, হিন্দুস্থানী (উর্দু), জাভানীজ তামিল ও শ্রীনগরী ভাষার বাইরেল প্রকাশ করে। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই অনুবাদ কার্য চলে, তারপর ঘোষণা করা হয়, "Serampore intended to devote the remainder of their lives to new and more correct edition of the translations already made." ৪০টি ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ কেরী নিজে সম্পাদনা করেন এবং বাকিগুলি তাঁর সহায়তায় প্রস্তুত হয়। অনেকগুলির একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়। প্রথম হতেই কেরীর বাইবেল অনুবাদ নানারূপ সমালোচনার সম্মুখীন হয়। অনুবাদ অপুষ্ট এবং সাহিত্যমূল্যহীন বলেও অনেকে সমালোচনা করেছেন। তাঁর অনুবাদ যে খুব সুখপাঠ্য হয়নি এ সম্বন্ধে কেরী নিজেও সচেতন ছিলেন এবং নতুন সংস্করণের সময় আপ্রাণ চেষ্টা করতেন অনুবাদকে উন্নত করার জন্য। প্রথমদিকে তাঁর প্রচেষ্টা ছিল অনুবাদ যাতে সাধারণের বোধগম্য হয় এবং সে বিষয় তিনি সফল হয়েছেন বলে যে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন তা তার অনেক বক্তব্যে প্রকাশ পেয়েছে। এক জায়গায় তিনি বলেছেন, "when a man read part of Mathew to a crowd near Serampore they clearly understood it though neither the reader nor audience had previously seen printed book." এ্যাডাম অভিযোগ করে ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে বলেন কেরী অনেকগুলি ভাষায় অনুবাদ একসঙ্গে করার পরিকল্পনায় একটির উৎকর্ষতার প্রতি নজর দিতে পারেন নি। রামমোহন এ্যাডামের উক্তি সমর্থন করেন এবং আরও বলেন, "they were neither accurate, nor free from sectarian influence as to the expression of christian Doctrine. ব্যাপটিষ্ট অনুবাদক জে. ওয়েঙ্গার হতে আরম্ভ করে বাংলা

সাহিত্যের ইতিহাস প্রণেতা সুকুমার সেন প্রমুখ অনেক সমালোচকই কেরীর বাংলা অনুবাদ সুপাঠ্য হয়নি বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। কেরীর সংস্কৃত, মারাঠি প্রভৃতি অনুবাদের এরূপ সমালোচনা করা হয়েছে। তাঁর অনুবাদের সপক্ষেও সমালোচনা আছে। সে যুগের অনেক ভারতীয় পণ্ডিত এই অনুবাদগুলির উচ্চ প্রশংসা করেছেন। ক্লডিয়াস বুকানন প্রমুখ পণ্ডিতেরাও কেরীর অনুবাদের মধ্যে নিরুৎসাহিত হবার কিছু দেখেন নি। এযুগের সমালোচকরাই মিশ্র ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে হিন্দি বাইবেল সম্বন্ধে বলেছেন, ''a purity of style which is remarkable considring the period at which he wrote and that which preceeded it.''

সমালোচনা যেরূপ হোক না কেন, অনুবাদের ক্ষেত্রে এবং ভারতীয় গদ্য সাহিত্যের সূচনার ক্ষেত্রে কেরী যে পথিকৃত এবং তাঁর অবদান যে বিস্ময়কর একথা কেউই অস্বীকার করতে পারেননি। কেরী ও তাঁর সহযোগী বন্ধুরা তাঁদের প্রচেষ্টার সাফল্য সম্বন্ধে সন্তুষ্ট ছিলেন এই ভেবে যে তাঁদের প্রয়াস শুধু বিভিন্ন ভাষায় বাইবেল প্রচারেরই সূচনা করে নি উপরন্তু আরও অনেককে এই কাজে উদ্বুদ্ধ করেছে। আমেরিকার ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর এই প্রয়াসের সফলতার স্বীকৃতি হিসাবে ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে তাঁকে ডক্টর অফ্ ডিভিনিটি উপাধি প্রদান করে।

বাইবেলের অনুবাদ ছাড়া বাংলা, সংস্কৃত, হিন্দি, তেলেগু, পাঞ্জাবী প্রভৃতি কয়েকটি ভাষার ব্যাকরণ রচনা করেন। সেগুলি সে সময় ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে একান্ত নির্ভরশীল সহায়ক ছিল। ব্যাকরণ ছাড়া তিনি কয়েকটি ভাষার অভিধানও রচনা করেন। ভারতীয় ভাষা শিক্ষার ইতিহাসে এগুলির মূল্য খুব কম নয়। কেরীর ব্যাকরণ ও অভিধানগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বাংলা ও সংস্কৃত ব্যাকরণ এবং বাংলা-ইংরাজি অভিধান। মদনাবতীতে থাকার সময়েই তিনি নিজের ব্যবহারের জন্য একটি সংক্ষিপ্ত বাংলা ব্যাকরণ ও শব্দকোষ রচনা করেন এবং ১৮০১ খৃষ্টাব্দে সেই ব্যাকরণকে বিস্তৃত করে প্রকাশ করেন। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে তার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ হয়। চতুর্থ সংস্করণের (১৮১৮ খৃঃ) ভূমিকায় তিনি বলেন, ' 'Bengal as the seat of the British Government in India and the centre of a great part of commerce in the East must be viewed as a country of great importance ... A knowledge of the language of this country must therefore be a very desirable object.'' কেরীর বাংলা ব্যাকরণ খুব উল্লেখযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও উইলসন ও অন্যান্য দু-একজন পণ্ডিত ছাড়া কেউই বইটির বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করেন নি। উইলসন বলেছেন, The Bengali Grammer of Dr. Carey explains the

peculiarities of Bengali alphabets and the combination of letters : ... the rules are comprehensive, though expressed with variety and simplicity, and the examples are numerous and well chosen.'' ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে কেরীর বাংলা ইংরাজি অভিধান প্রকাশিত হয়। এই অভিধানটি সে যুগ প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসাবে স্বীকৃত হয়েছিল। উইলসন এই অভিধানের সুদীর্ঘ সমালোচনা করে বলেন, The Dictionary of Dr. Carey must be regarded as a standard authority.''

বহু ভাষাবিদ হিসাবে কেরীর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তিটি কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে প্রকাশিত হয়নি। বহু বছরের সাধনা ও পরিশ্রমে তিনি ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় একটি বহুভাষিক শব্দকোষের পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন করেন। কিন্তু তা আর প্রকাশের সুযোগ পেলো না। মিশন প্রেসের অগ্নিকাণ্ডে (১৮১২ খৃষ্টাব্দে)-এর অধিকাংশ পাতাই পুড়ে ছাই হয়ে যায়। অবশিষ্টাংশ কেরী গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। পাণ্ডুলিপিটি আমাদের পুঁথির আকারের লম্বায় ২০.৫ ইঞ্চি ও চওড়ায় ৭.৭ ইঞ্চি, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩১২। তেরটি বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার শব্দ সংখ্যা আছে ২১৮৪। মূলভাষা সংস্কৃতকে ধরা হয়েছে এবং বাংলা অক্ষরে ইহা লেখা। পাণ্ডুলিপিতে দু-তিনটি হাতের লেখা দেখা যায়। এরমধ্যে একজন কেরী স্বয়ং বলে অনুমান করা হয়। কেরী গ্রন্থটির নাম দেন, ''A Universal Dictionary of Oriental Languages derived from Sanskrit, of which that language is to be the ground work.'' "এর পরিকল্পনা সম্বন্ধে তিনি লেখেন, ''I mean to take Sanskrit, of course, as the ground work and to give different acceptance of every word with examples of their applications in the manner of Johnson and then to give synonyms in the different languages derived from Sanskrit with the Hebrew and Greek terms answering there to ... This work will be great and it is doubtful whether I shall live to complete it, but I mean to begin to arrange the materials which I have been some years collecting for this purpose.'' হিব্রু ও গ্রীক প্রতিশব্দ সন্নিহিত করার পরিকল্পনা পরে তিনি পরিত্যাগ করেন। শব্দ কোষটি অমরসিং-এর বিখ্যাত সংস্কৃত কোষ গ্রন্থ অমরকোষের অনুসরণে লিখিত। কেরী সম্ভবত কয়েকটি খণ্ডে গ্রন্থটি প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন এবং সংরক্ষিত অংশটি বোধহয় এর একটি খণ্ড। বহুভাষিক ভারতবর্ষে এরূপ শব্দ কোষের প্রয়োজনীয়তা কেরী তখনই বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন এবং গ্রন্থটি প্রকাশিত হলে বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে সুসংযোগ স্থাপন করা আরও

সহজ হতো। সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপিটি প্রকাশ করার প্রয়োজনীয়তা আজও কম নয়। এরূপ শব্দকোষ বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে সৌহার্দ গড়ে তোলায় যথেষ্ট সহায়ক হবে। শিক্ষকতার প্রতি কেরীর সবচেয়ে বেশী আগ্রহ ও শ্রদ্ধা ছিল। অল্প বেতন হওয়া সত্ত্বেও তিনি ইংলণ্ডে থাকাকালীন একটি পাঠশালায় শিক্ষকতা করতেন। মদনাবতীতে বিদ্যালয় পরিচালনার কাজ তিনি সাগ্রহে গ্রহণ করেন। ফোর্ট-উইলিয়াম কলেজে ছিলেন অন্যতম জনপ্রিয় অধ্যাপক। ফোর্ট-উইলিয়াম কলেজের মর্যাদা ও গৌরববৃদ্ধি করার অনেকখানি কৃতিত্ব কেরী দাবি করতে পারেন। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি এই কলেজে অধ্যাপনা করে বিশেষ সম্মানের সঙ্গে অবসর গ্রহণ করেন। শ্রীরামপুর কলেজে তিনি ধর্মশাস্ত্রের সঙ্গে উদ্ভিদবিদ্যা, জীববিদ্যা, কৃষিবিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। বিজ্ঞান শিক্ষক হিসাবেও সে সময় তিনি বিশেষ সুনাম অর্জন করেন।

শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনা ও নীতি নির্ধারণে তাঁর মত তীক্ষ্ম চিন্তাশীলতার পরিচয় সে যুগে বোধহয় কেউই দেখাতে পারেন নি। নানা প্রতিকূলতা ও বিরোধিতার মধ্যে অধ্যক্ষরূপে শ্রীরামপুর কলেজকে শুধু স্বচ্ছন্দে পরিচালনাই করেন নি, উপরন্ত ধীরে ধীরে তার শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা পাবার উপযুক্ত করে তোলেন। মিশনের বিদ্যালয় সমূহ তাঁর পরিচালনায় চতুর্দিকে সম্প্রসারিত হয়। উদার ও মহৎ শিক্ষানীতি নির্ধারণেরও তিনি কোন বিরোধিতাকে গ্রাহ্য করেন নি এবং অপরের সমর্থনের আশায়ও বসে থাকেন নি। মাতৃভাষাকে শিক্ষার সর্বস্তরে মাধ্যম করা, প্রাচ্যের সাহিত্য ও দর্শনের সঙ্গে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানের উপযুক্ত সমন্বয়ে পাঠ্যক্রম তৈরি করা, শিক্ষা ক্ষেত্রে কোনরূপ সংকীর্ণতা বা সীমাবদ্ধতা না রাখা প্রভৃতি এককভাবেই গ্রহণ করতে মিশন যে দ্বিধা করেনি তা কেরীর বলিষ্ঠ, নির্ভীক ও দৃঢ় পরিচালনার গুণেই সম্ভব হয়েছিল।

বাংলা গদ্য সাহিত্যের স্রষ্টা হিসাবে কেরী আমাদের কাছে চিরবরণীয় ও স্মরণীয়। বাংলা সাহিত্যে কেরীর স্থান নিরূপণ করতে গিয়ে সজনীকান্ত দাস বলেছেন, "তিনি সর্বপ্রথম বাংলা ভাষাকে ভদ্র ও শিক্ষিত জনের আলোচ্য ভাষার মর্যাদা দান করিয়াছিলেন। একদিক হইতে আরবী ও ফার্সী এবং অন্যদিক হইতে সংস্কৃতের চাপে বাংলা ভাষার যখন মৃতকল্প অবস্থা, তিনিই তখন আশ্চর্য্যরকম দূরদৃষ্টি দেখাইয়া এই ভাষার আশ্রয়ে আত্মপ্রকাশ করেন।" বহুভাষাবিদ পণ্ডিত কেরী বাংলা সাহিত্যের বহু সম্ভাবনাময় ভবিষ্যত সম্পর্কে গভীরভাবে উপলব্ধি করেন সাহিত্যের সেই প্রাথমিক অবস্থাতেই এবং সেজন্য প্রাচ্যের নানা ভাষায় বুৎপত্তি লাভ করার পর বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে দ্বিধা করেন নি। বাংলা ভাষা সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, "Convinced as I am that the Bengali Language is

superior in point of intrinsic merit to every language spoken in India and in point of real utility yields to none.''

১৮০০ খৃষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে প্রকাশিত কেরীর 'মঙ্গল সমাচার' মতীয়ের রচিত বইটি বাংলা গদ্যের প্রথম পুস্তক। ইহা বাইবেলের একটি অংশ। পরের বছর তিনি নিউ টেষ্টামেন্টের সমস্ত অংশ বাংলায় প্রকাশ করেন।

এই অনুবাদ কার্যে তিনি টমাস, রামরাম বসু, ফাউন্টেন প্রভৃতির সাহায্য গ্রহণ করেন। ১৮০১ খৃষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী বইটি প্রকাশিত হয় এবং কেরীর জীবদ্দশাতেই এর আটটি সংশোধিত সংস্করণ মুদ্রিত হয়। নানা বিরূপ সমালোচনা হলেও বইটি সে সময় বিশেষ জনপ্রিয় হয়। কেরী সংকলিত বাংলা গদ্য সাহিত্যের প্রথম পুস্তক 'কথোপকথন' ১৮০১ খৃষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে প্রকাশিত হয়। বইটিতে সে সময়ের দৈনন্দিন জীবনের নানা ঘটনার বাস্তবচিত্র সরস সংলাপের মধ্যদিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে। ফোর্টউইলিয়াম কলেজের ছাত্রদের জন্য লিখিত হলেও গ্রাম্য চলিত ভাষার ব্যবহার ও সহজ প্রকাশ ভঙ্গির জন্য বইটি বিশেষ জনপ্রিয় হয় এবং এর কয়েকটি সংস্করণও প্রকাশিত হয়। বাংলাভাষা ও সাহিত্যশিক্ষার পক্ষে কথোপকথনের গুরুত্ব বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সংস্কৃত আশ্রয়ী বাংলা ভাষা পরিপুষ্টতা লাভ করার আগেই কথোপকথন চলিতভাষার সম্ভবনাময় ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দেয়। উইলসনের মতে ''বাংলা ফ্রেজ ও ইডিয়ামে পূর্ণ থাকায় বইটি বাংলা চলিতভাষা শিক্ষার পক্ষে বিশেষ উপযোগী।'' রেভারেন্ড জে, লং বলেছেন, ''বইটি এদেশীয় জীবনরীতি, চিন্তাধারা এবং বাকধারা সম্পর্কে প্রচুর আলোকপাত করেছে।'' বইটি কেরীর ঠিক নিজের রচনা নয়, তাঁর কৃতিত্ব এটির সংকলন ও সম্পাদনার। ভূমিকায় তিনি বলেছেন, ''I have employed some sensible natives to compose dialogues upon subjects of a domestic nature and to give them precisely in natural style of the persons supposed to speakers.'' তিনি বইটির পরিকল্পনা করলেও মূল রচনা তাঁর দেশীয় পণ্ডিতদের। বইটি সংকলনে কেরী যে সাহস, বিচক্ষণতা ও বিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন তা সত্যই বিস্ময়কর। একজন ধর্মাযাজক হয়ে বইটিতে তিনি গ্রামের মেয়ে-কোঁদলের ভাষাকে স্থান দিতে দ্বিধা করেন নি। যদিও এরজন্য তাঁকে অনেক বিরূপ সমালোচনা শুনতে হয়েছে। বইটির রচনায় যে সব পণ্ডিতদের হাত ছিল তাঁদের কৃতিত্বও অস্বীকার করা যায় না। বিশেষ করে পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের সুতীক্ষ্ম লেখনীর সহায়তা যে এতে ছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়। অন্য কোন পণ্ডিত তাঁর মত মৌখিক গ্রাম্য ভাষা ও প্রচলিত বাংলা ইডিয়ামের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। ১৮০১-১৮০২ খৃষ্টাব্দে তিনি ৩

খণ্ডে বাংলা রামায়ণ ও মহাভারত মুদ্রিত করান। আমাদের এই সুপ্রাচীন মহাকাব্য দুটিকে প্রচারিত ও জনপ্রিয় করার মধ্যদিয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধার পরিচয়ই পাওয়া যায়। পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার পরে মহাকাব্য-দুটির সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশ করেন। পরবর্তিকালে রামায়ণ-মহাভারত প্রণেতারা শ্রীরামপুর সংস্করণের আদর্শে অনুপ্রাণিত হন।

কেরীর আর একটি উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকীর্তি 'ইতিহাসমালা' ১৮১২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইতিহাসমালা নামে ইতিহাস হলেও প্রকৃত ইতিহাস নয়। আসলে ইতিহাস আশ্রিত কাহিনীর সুন্দর সংকলন। ভাষা অনেক সহজ ও সরল এবং পূর্বের বই এর চেয়ে অনেক উন্নত হয়েছে। কিন্তু খুব বিস্ময়ের ব্যাপার সমসাময়িক যুগে প্রকাশিত কোন তালিকাকেই বইটির উল্লেখ পাওয়া যায় না। ফোর্টউইলিয়াম কলেজের পাঠ্যপুস্তক হিসাবেও বইটি ব্যবহৃত হয়নি। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে বাংলা গদ্য সাহিত্যের সূচনা হয় এবং বারো বছরের মধ্যেই দেশিয় পণ্ডিতদের ও কেরীর প্রচেষ্টায় ভাষা সৌকর্যের বিস্ময়কর উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায় ইতিহাসমালায়। কথোপকথনের মত ইতিহাস মালাও কেরী দেশীয় পণ্ডিতদের সহায়তায় সংকলন করেন বলে অনেকে অনুমান করেন। ফাদার দ্যতিয়েন সম্প্রতিকালে ইতিহাসমালার নতুন সংস্করণ প্রকাশ করার সময় বলেছেন, 'রচনাকালে কেরী এমন একজনের সাহায্য পেয়েছেন যিনি কেরীর এবং সম্ভবতঃ নিজেরই অজান্তে সত্যিকার সাহিত্যিক ছিলেন। আমার অনুমিত এই যে ইতিহাসমালার উৎকর্ষের জন্য দায়ি সেই অচেনা বাঙালি সন্তান।'

কেরী শুধু নিজের সংকলনের দ্বারা বাংলা গদ্য সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করেই ক্ষান্ত হন নি, বাংলা গদ্যের ব্যাপক ও দ্রুত প্রসারের জন্য বাঙালি পণ্ডিতদের নানাভাবে অনুপ্রাণিত করেছেন। ফোর্টউইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতদের তিনি বাংলা গদ্য রচনায় শুধু উদ্বুদ্ধই করেন নি, রচনায় নানাভাবে সাহায্য করেছন, মুদ্রণ ও প্রকাশের ব্যবস্থা করেছন, প্রচারের ব্যবস্থা করেছেন এবং পাঠ্যপুস্তক হিসাবে ফোর্টউইলিয়াম কলেজে অনুমোদিত করিয়ে তাঁদের আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থাও করেছেন। কেরীর জন্যই বইগুলি প্রকাশিত হতে পেরেছিল, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার রামরাম বসু, গোলোকনাথ শর্মা, তারিণীচরণ মুন্সী, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, উইলিয়াম ইয়েট্‌স্, ফেলিক্স কেরী, জন ক্লার্ক মার্শম্যান প্রমুখ সে সময়ের সব গ্রন্থকারেরাই প্রত্যক্ষভাবে কেরীর সহায়তা ও অনুপ্রেরণা লাভ করেছেন। বাংলা গদ্যের স্রষ্টার পদে কেরীকে অভিযুক্ত করতে তাই কোনরূপ দ্বিধা হয় না। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "Carey was the pioneer of the

revived interest in the vernaculars.'' বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একালের সূচনাকারী কেরী দিয়ে শুরু করে পরপর মৃত্যুঞ্জয়, রামমোহন, ঈশ্বরগুপ্ত, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, প্রমুখ সাহিত্য কীর্তি অনুধাবন না করে বঙ্কিম ও রবীন্দ্র যুগে প্রবেশ করা যায় না।

কেরী ছিলেন বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ সাধক। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী কেরীর কর্মপ্রচেষ্টা বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রসারিত হওয়ায় বিজ্ঞানী কেরীর পরিচয় আমরা খুব বেশি জানতে পারিনি। অথচ এদেশে পাশ্চাত্য ধারায় বিজ্ঞান চর্চার সূচনাতে তাঁর অবদান অপরিমেয়। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিশেষ করে উদ্ভিদ ও কৃষি বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগের কথা আমাদের অবিদিত নয়। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে জন ডায়ার বলেছেন, ''No person be more passionately fond of natural history than Dr. Carey.'' উদ্ভিদ ও প্রাণী জীবনের রহস্যের প্রতি বাল্যকাল হতেই গভীর আকর্ষণ অনুভব করতেন। বিচিত্র বৃক্ষলতাদি পূর্ণ উদ্যান রচনা বা কীট পতঙ্গের কৌতুহলোদ্দীপক জীবনযাত্রা লক্ষ্য করা ছিল তাঁর বাল্যকালের সবচেয়ে প্রিয় কাজ। এ সম্বন্ধে ডব্লু, এইচ্, কেরী লিখেছেন, ''The room, which was wholly appropriate to his use, was full of insects stuck in every corner that he might observe their progress.'' ভারতে আসার পর তিনি উদ্ভিদ চর্চার প্রচুর সুযোগ পান। মদনাবতীতে থাকার সময় তিনি জঙ্গলের মধ্যে একটি খামার তৈরী করেছিলেন এবং সেখানে বিভিন্ন রকমের দেশীয় গাছের বীজ উৎপাদন করে ইংলণ্ডে পাঠাতেন। একটি চিঠিতে তিনি লেখেন, ''seeds of our sour apples pears, nectraines, plums, apricots, cherries, gooseberries, currants, strawberries or raspberries, put into a box of dry sand and sent so as to arrive in September, October, November, December, would be a great aquisition as in every European production.'' ফুলার ও রাইল্যাণ্ডকে লেখা তাঁর বহু চিঠিতেই বাংলাদেশের গাছপালা, চাষবাস প্রভৃতি সম্বন্ধে তাঁর নানা অভিজ্ঞতার কথা থাকতো। রাইল্যাণ্ডকে লেখা চিঠিতে ছিল, ''The natural history of Bengal would furnish innumerable novelties to a curious inquirer. I am making collections of minute descriptions of whatever I can obtain, and intend at some future time to transmit them to Europe. মদনাবতীত তিনি যে খামার ও উদ্ভিদ উদ্যান রচনা করেন তাতে বিদেশ হতে আমদানীকৃত বীজের বহু ফুল ও ফলের গাছ ছিল কিন্তু উদ্যানের মায়া ত্যাগ করে তাঁকে শ্রীরামপুরে চলে আসতে হয়েছিল। তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের

উদ্ভিদ বিজ্ঞানীদের সঙ্গে বীজ ও চারা গাছ বিনিময়ের জন্য নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন এবং বহু বিজ্ঞানীর সঙ্গে তাঁর সৌহার্দ জন্মে। তাঁর সবচেয়ে ঘনিষ্ট বন্ধু শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের অধ্যক্ষ ডাঃ রক্সবার্গ। উভয়ে ছিলেন উভয়ের প্রেরণার উৎস এবং দুজনের বিজ্ঞান সাধনায় সাফল্য সম্ভব হয়েছিল পরস্পরের সাহায্যে ও সহযোগিতার জন্য।

শ্রীরামপুরে আসার পর এখানে তিনি পাঁচ একর জমিতে একটি মনোরম উদ্ভিদ উদ্যান প্রতিষ্ঠা করেন এবং মদনাবতী হতে আনা বহু বীজ এখানে রোপন করেন। কেরীর উদ্যান সেযুগে শিবপুরের উদ্যানের মতই প্রসিদ্ধ ছিল। পৃথিবীর নানান দেশের বৃক্ষলতাদি এখানে আনান এবং বিনিময়ে সে সমস্ত জায়গায় পাঠান বাংলাদেশের বিশিষ্ট বৃক্ষলতাদির বীজ। ভারত ও বাংলার বিভিন্ন স্থানেও তিনি বীজ ও চারাগাছ নিয়মিতভাবে সরবরাহ করতেন। অধ্যাপক ব্রুল বলেছেন, ''Many plants to be found in Bengal to-day came of seeds first bird borne or wind sown from Carey's garden.'' তাঁর উদ্যানের উল্লেখযোগ্য সম্পদ ছিল বহু দুষ্প্রাপ্য গাছপালা। উদ্যান রচনায় তিনি লিনিয়ান পদ্ধতি অবলম্বন করেন। ছায়াছন্ন বীথিগুলি উদ্যানের শোভা বৃদ্ধি করে এবং সবচেয়ে সুন্দর বীথিটির নাম ছিল Carey's walk. ডেইজী ফুল কেরীর খুব প্রিয় ছিল। ডেইজীর বীজ পাঠাবার জন্য তিনি ইংলণ্ডের বন্ধুদের লেখেন। কিন্তু কোন উত্তর না পেয়ে খুব দমে যান। অনেক পরে অজানা কিছু বীজ হতে ডেইজীর চারা বেরুতে দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যান। তাঁর আনন্দের রূপটি ফুটে ওঠে মন্টোগোমারীর ডেইজী কবিতায় ঃ

Thrice welcome, little English flower
My mother country's white and red,
In rose or lily, till this hour
Never to me such beauty spread.''

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বহু দর্শক আসতেন এই মনোরম উদ্যানটির শোভা দেখবার জন্য এবং ব্রাণ্ডিস, ক্লেগহর্ণ প্রভৃতি বনরক্ষকগণ আসতেন গাছপালার বৃদ্ধি, পুষ্টি প্রভৃতি সম্বন্ধে গবেষণা করতে। কেরীর অন্তরের অনেকখানি জুড়েছিল এই উদ্যানটি। এইখানেই ছিল তাঁর বক্তৃতামঞ্চ, প্রার্থনাবেদী, এইখানেই তিনি দিনের কাজ শুরু ও শেষ করতেন। শুধু নিজে উদ্যান রচনা করেই তিনি শান্ত হন নি। তাঁর এই প্রয়াসের প্রভাবও চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিতে উদ্যোগী হন। দিল্লি, ঢাকা, হরিদ্বার, শাহারানপুর প্রভৃতি জায়গায় অনেকে তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে উদ্যান প্রতিষ্ঠা করেন। এইসব উদ্যানের সঙ্গে তিনি সবসময় যোগাযোগ রাখতেন। তবে বন্ধু রক্সবার্গের উদ্যান শিবপুর

উদ্যানের সঙ্গেই তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল সবচেয়ে বেশি। এই উদ্যানের উন্নতির জন্য রক্সবার্গকে এবং পরে ন্যাথানিয়েল ওয়ালিচকে সর্বতোভাবে সাহায্য করতেন। রক্সবার্গেরও কেরীর প্রতি ছিল গভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতি। রক্সবার্গ প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ একটি অজ্ঞাত শাল বৃক্ষের নাম দেন Careya Saulea, কিন্তু কেরী এতে খুব অস্বস্তিবোধ করেন। তাঁর অনুরোধে রক্সবার্গ বোধহয় পরে বৃক্ষটির নাম পরিবর্তন করেন। বর্তমানের Shorea Robusta-রই বোধহয় পূর্বে নাম ছিল Careya Saulea। কিন্তু তা সত্ত্বেও রক্সবার্গ কেরীর নাম ভারতীয় উদ্ভিদ বিজ্ঞানের সঙ্গে বিজড়িত রাখার জন্য একজাতীয় গুল্মের নামকরণ করেন Careya। এই জাতীয় গুল্ম কেবল ভারতেই পাওয়া যায় এবং ওষুধ তৈরিতে এর পাতা খুব কাজে লাগে। Careya জাতীয় গুল্মের তিনটি শ্রেণীর একটি Careya Harbacea কেরী নিজেই তরাই অঞ্চলে আবিস্কার করেন। এর অপর দুটি শ্রেণী Carey Arborea and Careya Sphoerica ভারতের বিভিন্ন স্থানে পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ উদ্ভিদ বিজ্ঞানি বেঞ্জামিন ডেলেসার্ট তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Musse Botanique-এ এবং যশস্বী বিজ্ঞানি জন গ্রাহাম তাঁর দুষ্প্রাপ্য বৃক্ষলতাদির গ্রন্থালেখ্যতে শ্রদ্ধার সঙ্গে ডাঃ কেরীর নাম উল্লেখ করেছেন।

এশিয়াটিক সোসাইটি এবং অন্যান্য স্থানে উদ্ভিদ ও কৃষি-বিজ্ঞানের ওপর তিনি অনেকগুলি বক্তৃতা দেন এবং এদেশের কৃষি-উন্নয়নে তাঁর আন্তরিক আগ্রহের কথা বিশেষভাবে প্রকাশ করেন। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে এশিয়াটিক রিসার্চে "State of Agriculture in the District of Dinajpore." নামক প্রবন্ধে এদেশের শোচনীয় কৃষিব্যবস্থার মর্মন্তুদ বিবরণ দেন এবং কৃষিউন্নয়নের জন্য কি করা উচিত তা বিশদভাবে আলোচনা করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "In one of the finest countries in the world, the state of agriculture and horticulture is so abject and degraded and the people's food so poor and their comforts are so meagre."

কৃষি উন্নয়নে তাঁর বিরামহীন চেষ্টার মধ্য দিয়ে জানা যায়, গরিব চাষীদের দুর্দশার কথা তাঁর দরদী মনের কতটা দখল করেছিল। এই চেষ্টার ফলেই কৃষি ব্যবস্থার উন্নতির প্রতি তিনি লর্ড হেস্টিংসের সহায়তায় ১৮২০ খৃষ্টাব্দে Agri Horticultural Society for India স্থাপন করতে পারেন। প্রাথমিক পর্যায়ে নানা অসুবিধা থাকায় সোসাইটির প্রসার আশানুরূপ না হলেও ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে নিজস্ব জমি হওয়ার পর হতে এর কর্মক্ষেত্র বিস্তার লাভ করে এবং ভারতের কৃষি উন্নয়নে নানাভাবে সাহায্য করতে থাকে। ভারতের বনজ সম্পদ যে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ এ বিষয়ে সরকার ও জনসাধারণের দৃষ্টি কেরীই আকর্ষণ করেন। তিনি আক্ষেপের সঙ্গে বলেন,

"The cultivation of timber has hitherto been neglected." অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান দিয়ে তিনি বনসংরক্ষণের নানা প্রস্তাব সরকারকে দেন। তবে তাঁর জীবদ্দশায় সরকার এ ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগ দেয়নি। শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের বৃক্ষলতাদির তালিকা কেরী সম্পাদিত Hortus Bengalenis-এ প্রকাশিত হয়। বন্ধু রক্সবার্গের Flora Indica-ও কেরীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। ওয়ালিচ তাঁর Plantae Asiatic Rariores-এ কেরীর সংগ্রহের কথা বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেন। কেরীর উদ্ভিদ উদ্যানের পরিচয় প্রকাশিত হয় Voigt-এর Hortus Subarbanas Calcuttansis নামক গ্রন্থে।

উদ্ভিদবিদ্যা ব্যতীত পশু, পাখি, কীট-পতঙ্গ, শঙ্খ, খনিজ দ্রব্যাদি প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়েও কেরীর অনুরাগ ছিল প্রবল। এসব বিষয়ে তাঁর সংগ্রহ ছিল প্রভূত এবং বিশেষ মূল্যবান। বিভিন্ন পত্রাদিতে তিনি একাধিকবার এদেশের প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিস্তৃত ইতিহাস রচনার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু সময় ও সুযোগের অভাবে বোধহয় তাঁর সে ইচ্ছা পূরণ হয় নি। তাঁর সমস্ত সংগ্রহ শ্রীরামপুর কলেজকে দান করার সময় বলেন, "I give and bequath to the College of Serampore, the whole of my Museum of minarals, corals, shells, insects and other natural curiosities and a Hortus Siccus. Also the folio edition of Hortus Woberensis, which was presented to me by Lord Hastings." কিন্তু খুবই দুর্ভাগ্যের বিষয় কেরীর সুবিপুল সংগ্রহের খুব সামান্য অংশই রক্ষিত হয়েছে।

পাশ্চাত্য ধারায় বিজ্ঞান শিক্ষা প্রর্বতন ও প্রসারে কেরীর দান অতুলীয়। বিজ্ঞান শিক্ষার মাধ্যম সম্বন্ধে তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা যথাযথ ভাবে দেওয়া যায় না। শ্রীরামপুর কলেজে তিনি বাংলায় বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা প্রচলন করেন এবং মার্শম্যান, ফেলিক্স, পীয়ার্স, ইয়েট্স্, ম্যাক প্রমুখ সহযোগিবৃন্দকে বাংলায় বিজ্ঞানের পুস্তক রচনায় উৎসাহিত করেন।

বিজ্ঞানি হিসাবে সে যুগে তিনি যথেষ্ট সমাদর ও সম্মান লাভ করেন। বহু বিদ্বজ্জন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল এবং এগ্রিহর্টি কালচারাল সোসাইটির সম্পাদক ও সভাপতিরূপে তাঁর প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা ছিল ভারতের সর্বত্র। তিনি ইংলন্ডের লিনিয়ান সোসাইটি, জিওলজিক্যাল সোসাইটি ও হর্টি-কালচারাল সোসাইটির ফেলো মনোনীত হন। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হলে এশিয়াটিক সোসাইটি নিম্নলিখিত শ্রদ্ধাঞ্জলিটি প্রকাশ করে, "Asiatic Society cannot note upon their procedings the

death of Rev. William Carey D.D., so long an active member and ornament of this Institution, distinguished alike for his high attainments in the oriental languages, for his eminent services in opening the stores of Indian Literature to the Knowledge of Europe, for his extensive acquaintance with the sciences, the natural history and botany of this country and his useful contributions, in every branch, towards the promotion of the society, without placing on record of their sense of his value and merits as a scholar and a man of science, their esteem for the sterling and surpassing religious and moral excellencies of his character and their sincere grief for his irrepairable loss.''

ধর্মান্তরকরণে ব্রতী কেরীর হিন্দু সমাজ সংস্কারকের ভূমিকা সত্যই বিস্ময়কর। হিন্দুসমাজের কুসংস্কার দূর হলে, অসহায় মানুষের ওপর নিপীড়ন বন্ধ হলে হিন্দু সমাজের উন্নতি এবং এই সমাজের উন্নতি তাঁর ধর্মপ্রচারে সাহায্য করবে না। তাই খুব আশ্চর্য্য লাগে যখন দেখি তিনি শুধু সামাজিক কুপ্রথাগুলির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেই ক্ষান্ত হন নি, উপরন্ত ঐগুলি দূরীকরণের জন্য আজীবন অক্লান্ত সংগ্রাম করে গেছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে কেরী যখন এদেশে পদার্পণ করেন তখন আমাদের সমাজের অবস্থা গতিহীন বদ্ধ জলাশয়ের মত। ধর্ম ও সমাজের নামে দরিদ্র ও অসহায় মানুষের ওপর নিপীড়ন কেরীর সংবেদনশীল মনকে যথেষ্ট নাড়া দেয়। সামাজিক অনাচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সংকল্পও জাগে তাঁর মনে। তখনকার বর্বরোচিত কুপ্রথার মধ্যে সাগরে শিশু বিসর্জন, সতীদাহ, কুষ্ঠরোগী হত্যা, গঙ্গাজলি, চড়ক প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই প্রথাগুলির উচ্ছেদের জন্য তিনি এদেশে পদার্পণের পর হতেই সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করেন। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে উডনী প্রথমে সাগরে শিশু বিসর্জন প্রথাটির প্রতি কেরীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কোন বিপদ হতে উদ্ধার পাবার জন্য কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ সাগরে শিশু বিসর্জনের মানত করতো। পৌষমাসে সাগরদ্বীপের মেলায় শতশত শিশু বিসর্জিত হতো সাগরের জলে। এই প্রথা রোধে কেরী উডনীকে বিশেষ সাহায্য করেন। উভয়ের চেষ্টায় লর্ড ওয়েলেস্‌লির দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয়। কোম্পানীর রাজত্বে তখনও নিরাপদ স্থায়িত্ব আসেনি। এদেশের ধর্ম ও সামাজিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নীতি অনুসরণের পক্ষপাতী ছিল কোম্পানি। কিন্তু তা সত্ত্বেও ওয়েলেস্‌লী কেরীর আগ্রহে এবিষয়ে মনোযোগ দিতে স্বীকৃত হন। তিনি কেরীকে এ

বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ দাখিল করতে বলেন। কেরী প্রথাটির বিস্তৃত বিবরণ সংগ্রহ করেন এবং হিন্দু পণ্ডিতদের মতামত নিয়ে ওয়েলেস্‌লীকে জানান যে প্রথাটি সম্পূর্ণ সামাজিক, ধর্মের অনুশাসন এর পেছনে নেই। তিনি গভর্নর জেনারেলকে বিশেষভাবে আশ্বস্ত করেন যে এ-প্রথা রহিত হলে সমাজে গণ্ডগোল হবার কোন আশঙ্কা নেই। কেরীর রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে লর্ড ওয়েলেস্‌লী ১৮০২ খৃষ্টাব্দে আইন দ্বারা এই প্রথা রহিত করেন। ইংরেজের আইন দ্বারা হিন্দু সামাজিক প্রথা রহিত হওয়া এইটিই প্রথম। নব্যযুগে সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে কেরী তাই পথিকৃতের গৌরবের অধিকারী। মার্শম্যান বলেছেন, This was the first instance of any interference by the British Government with religious observances of the natives, and the first vindication of the principles of humanity in opposition to the superstitious feelings of the people.''

কুষ্ঠরোগীকে জীবন্ত হত্যা করার প্রতিরোধেও তিনি অনেকাংশে সফল হন। তখন কুষ্ঠরোগীর চিকিৎসা বা রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধের কোন ব্যবস্থা ছিল না। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে তিনি কাটোয়ায় কুষ্ঠরোগীকে পুড়িয়ে মারার দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেন এ দৃশ্য তাঁর মনে প্রচণ্ড আঘাত দেয়। কলিকাতায় ফিরে তিনি কুষ্ঠরোগীদের হাসপাতাল স্থাপনে উঠে পড়ে লাগেন। কলিকাতার বদান্য ব্যক্তিদের সহায়তায় তাঁর সে প্রচেষ্টা সফল হয়। তাঁর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সমাজ সংস্কারকেরা ভারতের দিকে দিকে প্রচার করতে থাকেন, "বেওয়া মাত জ্বালাও, বেটি মাত মারো, কোড়হি মাত দাবাও। (Thou shall not burn the widows, thou shall not kill they daughters, thou shall not burn thy lepers.)''

কিন্তু সতীদাহ প্রথাটি রোধ করা খুব সহজে হয় নি। রক্ষণশীল সমাজ ইতিমধ্যে সজাগ হয়ে গেছে। তাই এই প্রথা রহিতে নানা বাদানুবাদ ওঠে এবং রক্ষণশীল পক্ষের প্রবল বিরোধিতা দেখা দেয়। এই প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনে কেরীর বিশিষ্ট ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং এই প্রথার অবসান করাতে তাঁর অবদান খুব অকিঞ্চিতকর নয়। সতীদাহ প্রথা বন্ধ করার প্রচেষ্টা শুরু হয় লর্ড ওয়েলেসলির আমল হতে। এই বর্বর প্রথা বন্ধ করার প্রার্থনা জানিয়ে কেরী লর্ড ওয়েলেস্‌লীকে বিস্তৃত বিবরণ দান করেন এবং বলেন ইহা সাধারণ নরহত্যার পর্যায়ভুক্ত। তাঁর বিবরণে প্রভাবিত হয়ে ওয়েলস্‌লী নিজামত আদালতের মতামত জিগ্যেস করেন। নিজামত আদালতের বিচারপতিরা ইংরাজের রাজনৈতিক অসুবিধা হতে পারে চিন্তা করে প্রথাটি সরাসরি বন্ধ করে দেওয়ার অভিমত দেন নি। ওয়েলস্‌লী তখন বিষয়টি সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধানের আদেশ দেন। কিন্তু ঠিক এই সময় ওয়েলেস্‌লিকে

ইংলণ্ডে ফিরে যেতে হয়। তিনি আর বিশেষ কিছু করতে পারেন নি। উইলবারফোর্সের মতে, "Wellesly leaned heavily towards prohibition and had he continued in India one year more the frequency of such scenes (Widow burning) would have been considerably reduced." লর্ড মিন্টো ও লর্ড হেস্টিংস এই প্রথাকে আংশিকভাবে দমন করতে চেষ্টা করেন। হেস্টিংসের নির্দেশে এবং কেরীর আগ্রহে সুপ্রীম কোর্টের পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার বিভিন্ন হিন্দুশাস্ত্র বিচার করে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে দেখান যে প্রথাটি কখনই অবশ্য পালনীয় কর্তব্য নয়। এই সময় এই প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনের নেতৃত্বে আসেন মহাত্মা রামমোহন। তাঁর নেতৃত্বে ভারতের নবজাগরণের ইতিহাসে উজ্জ্বলতম অধ্যায়। ধর্মমত ব্যাপারে রামমোহনের সঙ্গে কেরীর মতানৈক্য থাকলেও এ ব্যাপারে তাঁকে পূর্ণ সহযোগিতা করেছেন। শ্রীরামপুর মিশনের দুটি সংবাদপত্র Friend of India ও সমাচার দর্পণ এ আন্দোলনে যে ভূমিকা গ্রহণ করে তা অনুসরণযোগ্য আদর্শ। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে লর্ড বেন্টিক আইন প্রণয়ন করে এই প্রথাটি বন্ধ করে দেন। সেই আইনের বঙ্গানুবাদ করে দেন কেরী।

জগন্নাথের রথের চাকায় আত্মবিসর্জন, চড়কে বান বিদ্ধ হয়ে জীবন দান, গঙ্গাজলি প্রভৃতি কুপ্রথা দূরীকরণেও কেরী বিরামহীন সংগ্রাম চালিয়ে যান। দরিদ্র ও অসহায়ের ওপর অত্যাচারের বিরুদ্ধেও তাঁর আন্দোলন ছিল অপ্রতিহত, এদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করার প্রচেষ্টা ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। মদনাবতীতে থাকর সময়ে তিনি গ্রামের পীড়িতদের মধ্যে ওষুধ বিতরণের ব্যবস্থা করেন। শ্রীরামপুর মিশনের চিকিৎসা ব্যবস্থার ভার তাঁর ওপর থাকায় তিনি মিশনের ওষুধ গরিব লোকেদের মধ্যেও বিতরণ করতেন। শ্রীরামপুরের হাসপাতাল প্রতিষ্ঠায় কেরী ও তাঁর সহকর্মীবৃন্দ দিনেমার সরকারকে বিশেষভাবে সাহায্য করেন।

বহু অভাবী মানুষ মহাজনের চড়া সুদের কারবারে বলি হয়ে ঘর-বাড়ি, জমি-জমা, সবকিছু হারাতো। মহাজনের হাত থেকে এদের বাঁচবার জন্য কেরী ১৮২০ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরে একটি ব্যাঙ্ক স্থাপন করেন। সাধারণ মানুষকে সঞ্চয়ী হতে উৎসাহিত করাও ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য ছিল। এক বছরের মধ্যে পাঁচ হাজার পাউণ্ড জমা পড়ে। কিন্তু চার পাঁচ বছর সাফল্যের সঙ্গে পরিচালিত হবার পর নানা সংকটের জন্য ব্যাঙ্কটি বন্ধ হয়ে যায়।

আর্তের সেবার ক্ষেত্রে কিংবা বিপদগ্রস্থ মানুষের সাহায্যে মানব দরদী এই মনীষী সব সময়েই এগিয়ে গেছেন কোন কিছু বিচার না করেই। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে ৯ই জুন যখন এই মহামনীষীর জীবনাবসান হয় তখন সন্তান-সন্ততিদের জন্যে অর্থসম্পদ তিনি কিছুই রেখে যেতে পারেন নি, কিন্তু

ভারতের জনগণকে দিয়ে গেছেন নবজাগরণের বীজ, যা ভারতীয় জীবনকে আধুনিক সভ্যতার আলোয় আলোকিত করেছে।

বাংলা তথা ভারতকে তিনি গভীরভাবে ভালবেসে ফেলেন। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতে কাটিয়ে ভারতবাসীর সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করে গেছেন। ইংলণ্ডে আর কোনদিন ফিরে যান নি। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে তাঁর এক বন্ধুর কাছে তিনি লেখেন, ''My heart is weded to India, and though I am of little use, I fell pleasure in doing the little I can. বাংলাদেশে বাঙালিদের মধ্যে থেকে নিজেকে তিনি বাঙালি বলেই মনে করতেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের এক সভায় বলেন, ''হিন্দুদের মধ্যে দীর্ঘকাল বাস করিয়া আমি আজ বৃদ্ধ হইয়াছি। বঙ্গীয় ভাষা আমার মাতৃভাষার মতই আয়ত্ব হইয়াছে। আমি নিঃসংশয়েই বলিতে পারে যে এদেশের রীতিনীতি, আচার ব্যবহার, সংস্কার এবং হৃদয়াবেগের সহিত আমি এমনই পরিচিত হইয়াছি যে সময় সময় নিজেকে এদেশীয় বলিয়া সন্দেহ হয়।''

বাংলা তথা ভারতের কল্যাণে উৎসর্গীকৃত এই জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সজনীকান্ত দাস বলেছেন, গীতায় কর্মযোগীর যে সব বিশেষণ আছে তার সবই কেরীর মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়; কেরীকে আমি দধীচি বলে অভিহিত করতে চাই। দধীচির মত আত্মত্যাগের মধ্য দিয়েই তিনি আমাদের কাছে চিরস্মরণীয় ও চিরবরণীয়।

মুদ্রণে : লেজারপ্লাস, শেওড়াফুলি, হুগলী, দূরভাষ : ৬৩২-৫১৭৯